LOTUS BUD

দুর্গা পুজো আমাদের সকলের

বছরে বারোটা মাস | কালের চক্রে ঋতুপরিবর্তন হয়, প্রতিটি ঋতুর এক-একটা বৈশিষ্ট্য আরছ | ফলে ফুলে প্রকৃতিকে নতুন নতুন রূপে সাজায় | আর এই ঋতুগুলোকে আমরা আবাহন করি উৎসবের মাধ্যমে | তবে বাঙালিদের প্রধান উৎসব দুর্গা পুজো | বর্ষার ঘন মেঘের ঘনঘটার শেষে মা দুর্গা আসেন তার পিত্রালয়ে | রথ যাত্রা থেকে প্রস্তুতি চলে বাঙালিদের ঘরে ঘরে | ভালোবাসা আর মনুষ্যত্ব টানে রখকে, প্রেমের দড়ি দিয়ে। সেই দিন মায়ের প্রতিমা বানানো শুরু হয় | এই পূজাতে মা আর মেয়ে যেন এক হয়ে যায় | তল্পি তল্পা নিয়ে দুর্গা আসেন বাপের বাড়ি । বাড়িতে সে কি উচ্ছাস! ছোট, বড়ো, কুচো, কাঁচা, সবাই ঘিরে ধরেন মেয়েকে । কেউবা শুনবেন শশুড়বাড়ির গল্প, কেউবা বলবে মনের কথা। বাঙালিয়ানায় দুর্গা পুজো শাস্ত্রসম্মত বিধি নিষেধ আর উপাচারের সীমানা ছাড়িয়, যেন জীবন বোধ ও জীবন বীক্ষায় মিলেমিশে একাকার ।

বাঙালিরা সব আনন্দে মেতেছে | নতুন জামা, নতুন জুতো ! মা এসেছেন বলে কথা | এই প্যান্ডেল ওই প্যান্ডেল হপিং| কত দূর থেকে হাতে ঢাকীরা পুরানো জামা পরে আমাদের হৃদয়ে ঢাকের ঢেউ তুলে দিতে আসে। একটু কিছু যদি অর্থ উপার্জন হয় আর কিছু নতুন বা পুরানো জামা কাপড় ঝুলিতে আসে, তাই সম্বল করে নিয়ে ফিরবে পরিবারের কাছে। পুজোর চারটে দিন ঘরছাড়া মানুষগুলি।

ধর্মীয় ভেদাভেদ ঘুচিয়ে অষ্টমী তিথি তে মৃন্ময়ী মাতৃমূর্তির সামনে চিন্ময়ী রূপে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুকন্যাকে কুমারী হিসাবে পুজো করা হয় | কুমারী মায়ের রূপ ধূসর করে দেয় সাম্প্রদায়ক বিভেদকে । এক অষ্টমীর সকালে ক্ষীরভবানী মন্দির এ কাশ্মীরি মুসলমান কন্যাকে দূর্গা রূপে পুজো করেছেন হিন্দুর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ আর পূজার উপকরণ সাজিয়ে দিচ্ছেন, খ্রীষ্টান ঘরে জন্ম নেওয়া ভগিনী নিবেদিতা!

~ নন্দিনী শীল

অষ্টম শ্রেণী – গ

বাঙালি

বাঙালি, শব্দটা শুনলে প্রথমেই মাথায় আসে উৎসব। বাঙালি মানেই উৎসব, উদযাপন, নাচ, গান, আবৃত্তি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, খাওয়া। বাঙালিরা উন্মাদনায় মেতে ওঠার জন্য অজুহাত খোঁজে কেবল।

তবে এই উন্মাদনা শুধুই কি উৎসবের দিনগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ?

মোটেই না। দৈনন্দিন কাজ গুলোর মধ্যেও বাঙালি এক উৎসব সব সময় পালন হচ্ছে।

সকালে দাদুর হাতে খবরের কাগজের পাতা ওলটানোর ফাঁকে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার আওয়াজ আর বাড়ি থেকে কারুর বেরোবার সময় ঠাকুমার গলায়, "দুগ্গা দুগ্গা" না শুনলে যেন বাঙালির মন ভরে না।

রাতে কোন মিষ্টি আনা হবে খাবার জন্য, এ বিষয় বাবা কাকার গভীর আলোচনা শুনলে, মনে এক অদ্ভুত আনন্দ হয়।

দুপুরে চিংড়ি মাছের মালাইকারি খাওয়া হবে শুনে সবার মনে উচ্ছাস, কিংবা বিরিয়ানি মাংস খাবে বলে, বিয়ের অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করা এই বাঙালি সত্যি অন্যতম এক জাতি।

বাজারে গিয়ে দরদাম করার সময়? তাতে ও এক বাঙালিয়ানার ছোঁয়া থাকে।

বাঙালির হাসি, কান্না, রাগ, দুঃখ সব কিছুতেই এক উন্মাদনা রয়েছে।

আমরা যদি শুধু উৎসবের দিনগুলো দেখি, জীবনকে অরুচিকর মনে হতে পারে কিন্তু আমরা যদি প্রতিদিনের তৈরি করা স্মৃতি এবং উপভোগ্য মুহূর্তগুলো দেখি তবে আমরা বুঝতে পারব সেগুলো কতটা মূল্যবান। তারাই আসলে জীবনকে উৎসব করে তোলে।

-জয়স্মিতা বোস
VIII-D

"ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।"

তখন আমি প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী। আমার মা, বাবা ঠিক করলেন আমার ৫ বছরের জন্মদিনটা একটু ধুমধাম করে পালন করা হবে। এই উপলক্ষে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব অনেককে নিমন্ত্রণ করা হলো। আমার মা আমার বেশ কিছু বন্ধু ও তাদের মা, বাবাকে নিমন্ত্রণ করলেন।

তখন আমি অনেকটা ছোট হলেও আমার বেশ মনে আছে জন্মদিনের আগের দিন থেকেই আমার মনে এক অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল, বিশেষ করে জন্মদিনে বন্ধুরা আসবে, একসঙ্গে অনেক মজা করব, দারুন দারুন খাবার খাব, পুতুল নাচ হবে ইত্যাদি ভেবে। জন্মদিনের দিন সন্ধ্যেবেলা চারদিকে আলোর রোশনাই মৃদু সানাইয়ের সুর আর আমার আনন্দের মাঝে সঙ্গী হতে উপস্থিত হল আমার পরমকাঙ্খিত বন্ধুরা। আমি ওদেরকে আমার মা আর জেঠিমা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে নিয়ে গেলাম। জেঠিমা সকলকে চকলেট দিচ্ছিলেন। আয়েশা একটু দূরে ওর মায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। আমি 'আয়েশা', বলে একটু জোরে ডাকলাম জেঠিমার কাছ থেকে চকলেট নেওয়ার জন্য। আয়েশা এগিয়ে এল। জেঠিমা ওকে চকলেট দিলেন কিন্তু জেঠিমার মুখটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। একটু সরে গিয়ে জেঠিমা মাকে কিছু বলছেন মনে হল। মাও বোঝানোর মতো করে কি বলছিলেন জেঠিমাকে। যাইহোক, খুব আনন্দে কাটলো আমার জন্মদিনের প্রতিটা মুহূর্ত।

পরের দিন মা জন্মদিনের উপহারগুলো রঙীন কাগজের মোড়ক থেকে বের করে আমাকে দিচ্ছিলেন আর কে দিয়েছেন সেটা বলছিলেন। পাশের চেয়ারে জেঠিমাও বসেছিলেন। এমন সময় মা একটি সুন্দর পিগি ব্যাঙ্ক আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "নে, এটা আয়েশা দিয়েছে।" আমি জিনিসটা হাতে নিতেই, জেঠিমা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "এর পরে কোনো অনুষ্ঠানে যেন মুসলিম কাউকে নিমন্ত্রণ করা না হয় । এটা হিন্দু বাড়ি এবং এই বাড়িতে কৃষ্ণের নিত্যপূজা হয়।" আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে আমার মা জেঠিমাকে বললেন, "সময়ের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টায়। পূর্বে দিদা, ঠাকুমাদের সময়ে যেভাবে ভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে অস্পৃশ্যতা, ভেদাভেদ ছিল এখন সেটা অনেকখানি বদলে গেছে। মা সারদার কথায়, "শরতও আমার ছেলে, আমজাদও আমার ছেলে।" শিক্ষার প্রসারতা মানুষের জীবনবোধ এনে দেয়। একটি সদ্যোজাত শিশুকে প্রথম দেখে কেউ বলতে পারে না যে সে কোন ধর্মের। একটাই পরিচয় যে শিশুটি একটি মানবসন্তান। যখন একটি শিশু কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তখন সেই পরিবার যে ধর্মাবলম্বী হয় শিশুটিও সেই ধর্মেই দীক্ষিত হয়। ধর্ম অনুযায়ী আচার আচরণ, পূজাপার্বণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপের হয় কিন্তু এই সকল ধর্মের ভিন্নতা অনুসারে যে সকল উৎসব হয়, যেমন - দুর্গাপূজা, ঈদ, বড়দিন ইত্যাদি, তার উদ্দেশ্য একটাই; আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী সকলে মিলে একসাথে একটু আনন্দ করা, কাছে আসা। আনন্দের কোনো জাতপাত হয় না। এমন অনেক জায়গা রয়েছে যেখানে মুসলিম সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় দুর্গা পূজায় অংশগ্রহণ করছেন এবং সাহায্য করছেন। তেমনি আবার হিন্দুরা ঈদের নিমন্ত্রণে মুসলিম বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আনন্দ করছে, হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে খৃষ্টধর্মাবলম্বী মানুষদের সঙ্গে বড়দিনের

আনন্দ উপভোগ করছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছেন, "যত মত, তত পথ।" ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য ভিন্ন ধর্মের মানুষ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন এবং সাধনার পথও ভিন্ন ধরণের হয়, কিন্তু লক্ষ্য একটাই কারণ ঈশ্বর এক এবং অদ্বৈত। তাই ধর্ম যাই হোক না কেন, উৎসব সবার।"

অনিমিথা ঘোষ

VII-C

নতুন দুর্গা পুজো

আমরা কি সবাই আসলে একা?

একটা প্রবাদ বাক্য আছে 'যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন।' কথাটির মর্ম যদি সবাই সবার সাথে মিলেমিশে থাকি তাহলে কোথাও কোনো জায়গার অভাব হয়না। একটি ছোট তেঁতুল পাতায় ও নয়জন মিলেও থাকা যায়।

কয়েক শতাব্দী আগে যখন রাজবাড়ি বা জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজো হতো তখন আমরা দেখি মা দুর্গা, তার ছেলেমেয়েদের, বাহন সিংহ ও শত্রু অসুর কে নিয়ে এক চালাতেই বিরাজ করছেন। সুন্দর সংঘবদ্ধ পরিবার এক চালাতেই রয়েছেন। ঠাকুরের মতো পরিবারগুলো ছিল একান্নবর্তী। এখানে বাড়ির একজন কর্তা থাকতেন - তার কথাতেই পুরো সংসার চলতো। কারো সাধ্য ছিল না তার কথার অবাধ্য হওয়ার। পরিবারের ভালো মন্দ সবই তিনি পরিচালনা করতেন। বেশ চলছিল এই সময়। মানুষের মূল্যবোধ ছিল, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের ভালোবাসা, একে অপরকে বিপদে সাহায্য করা। পুরো গ্রামটাই যেন এক একান্নবর্তী পরিবার হয়ে থাকতো।

সবকিছুই পরিবর্তনশীল। ক্রমে ক্রমে সমাজে ঢুকতে আরম্ভ করল হিংসা ও প্রতিযোগিতা এবং সরলতা চলে যেতে শুরু করল। মানুষ একে অপরকে বিশ্বাস করতে পারছে না - এক অস্থির সমাজ। কারণগুলি কিছু বৈষয়িক, কিছু রাজনৈতিক। কেউ কারো সঙ্গে মিলেমিশে আর থাকতে চায়না, সকলেই চাইছে শুরু করতে তাদের নিজস্ব আলাদা সংসার। দেবী দুর্গার ছেলেমেয়েরা যেন আর মায়ের সাথে থাকতে চায় না। সরে গেল একচালা ঠাকুর - এলো থিম পুজো। এখানে এলো বিভিন্ন রকমের ঠাকুর বানানোর মাধ্যম। এলো ঠাকুরের সাজ শয্যার বৈপরীত্য। ঠাকুরের চেয়ে বেশি বড় হয়ে উঠলো প্যান্ডেলের সৌন্দর্য অভিনবত্ব।

একান্নবর্তী এক চালার নিচে থাকা পরিবারগুলো হয়ে গেল ছোট ছোট। মা বাবার ভাই বোন। তারা চেনে না তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। রোজ নতুন নতুন ব্যবহারিক জিনিসের আবির্ভাব। এত তাড়াতাড়ি নতুন জিনিস এসে যায় যে কোন কিছুর প্রতি আন্তরিকতা, কোনো ভালোবাসা তৈরি হওয়ার সময় পায় না। প্রতিদিনের জীবন হয়ে ওঠে যন্ত্র চালিতের মতো। আত্মীয় পরিজন থেকে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হতে থাকে, দরকারে কেউ কাউকে পায় না। চারিদিকে এত লোক কিন্তু কজনকে আমরা চিনি বা জানি। এসে গেল একা থাকার যুগ। চারিদিকে ঐশ্বর্য, আনন্দের সমারোহ কিন্তু ভিতরে ভিতরে সবাই একা। একজনের চিন্তা ভাবনার সাথে অন্যজনের চিন্তার কোন মিল নেই।

আর্থিক সামাজিক পরিবর্তনে আমরা এখন সবাই একা।

অবন্তিকা সেনগুপ্তা

অষ্টম শ্রেণী - ক